জহিরুল ইসলাম

স্মৃতি: ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫

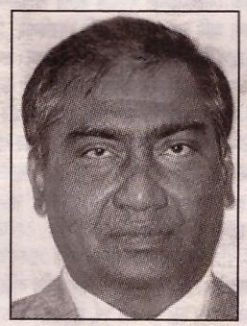

১৯৭৫ সালে আমি কৃষিতে মাস্টার্সের থিসিসের জন্য গবেষণা করছিলাম। গবেষণা প্রায় শেষ করে থিসিস লিখতে শুরু করেছি মাত্র। যদিও আমি ১৯৬৭ সাল থেকেই ঢাকা শহরের শেরেবাংলা নগরে কৃষি কলেজ (বর্তমানে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়) ছাত্রাবাসে থাকতাম কিন্তু ১৯৭৫ সালে আমি মূলত ঢাকা শহরের জিগাতলা এলাকায় আমাদের বাসায়ই ছিলাম। ১৪ আগস্ট সকালে কিছু রেফারেন্স সংগ্রহের জন্য আণবিক শক্তি কমিশনের পাঠাগারে গিয়েছিলাম। আণবিক শক্তি কমিশনের সদর দপ্তর তখন বাংলা একাডেমী ও টিএসসি'র মাঝে ছিল (বর্তমানে সাভারে)। পরদিন ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে সমাবর্তনে আসবেন। দেশ স্বাধীন হবার পর এটিই প্রথম সমাবর্তন। যে বিশ্ব বিদ্যালয় থেকে পাকিস্তান আমলের গোঁড়ার দিকে বঙ্গবন্ধুকে বহিষ্কার করা হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী আদায়ের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য। তিনিই এখন সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর? কাল সেখানে তিনি আসবেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হয়ে। তাই ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ে সাজ সাজ রব। পুরো এলাকাটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ও সাজানো গুছানো হচ্ছে। কে বা কারা বাজারে গুজব ছড়িয়েছে 'ঐ দিন কিছু একটা ঘটবে?' তখন জাসদের গণবাহিনী তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে খুব তৎপর। আর চরমপন্থি সিরাজ শিকদারের তথাকথিত সর্বহারা বাহিনীর বুর্জুয়া খতমের কর্মকাণ্ড জানুয়ারি ১৯৭৫-এ তাদের নেতার মৃত্যুর পর স্তিমিত হয়ে আসছিল। গুজবের তোরে তখন ঢাকা শহরেই কেমন যেন একটা থম থমে ভাব। সাধারণ মানুষের মধ্যেও গুজবের তোড়ে বেশ উৎকণ্ঠার বিস্তার হয়েছে, 'কাল কি জানি কি হয়?' তার উপর দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় একটি বোমা ফাটল। তাতে করে উৎকণ্ঠা তুঙ্গে উঠে। লোকজন আগে আগে অফিস বন্ধ করে বাড়ী চলে যায়। অগত্যা দুপুরের পর পাঠাগার থেকেও আমাকে বিদায় নিতে হল।

১৫ আগস্ট সকালে গুলাগুলির শব্দে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। ধানমন্ডিতে ভারতীয় হাই কমিশন, শেখ ফজলুল হক মনি ও তোফায়েল আহমেদের বাসা আমাদের বাসা থেকে এক কি.লামিটারেরও কম দূরত্বে। বিছানা ছেড়ে গেইটে এসে দেখি মা ও ছোট বোনেরা গোলাগুলির উৎস ও কারণ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত ভাবে রাস্তার দিকে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে। তাদের প্রশ্ন হল কেন গুলি হল? কোথায় গুলি হল? আমি তাদের উৎকণ্ঠা প্রশমনের জন্য বললাম যে, 'আজ ১৫ই আগস্ট, ভারতের স্বাধীনতা দিবস। তাই ওরা হয়ত ধানমন্ডি ২নং রোডে ওদের হাই কমিশনে বাজি ফুটিয়েছে।' ওরা সন্দেহ প্রকাশ করল যে এগুলি বাজির শব্দ নয় গুলীরই শব্দ ছিল। মুক্তিযুদ্ধের কারণে বাংলার মানুষ এখন কোনটা গুলির শব্দ তা বুজতে পারে। আমি লুঙ্গী পড়া অবস্থায়ই বাসা থেকে বের হয়ে গেলাম শব্দের কারণ অনুসন্ধানে। হাটতে হাটতে জিগাতলা বাস স্ট্যান্ডে এসে উত্তরে মোড় নিয়ে ধানমন্ডি ১৩/২ রোডের কোনে পুলিশ ফাঁড়ির গেইটের সামনে থামলাম। রাস্তাঘাট জনশূন্য, কোন গাড়ী ঘোরা চলছে না। ফাঁড়ির গেইটের ভিতর থেকে একজন পুলিশ মাথা উঁচু করে সাতমসজিদ রোডে কি যেন দেখছে আবার নিচু হয়ে লুকিয়ে যাচ্ছে। আমি গোলাগুলি কোথায় হয়েছে জানতে চাইলাম। তিনি বললেন যে, 'কিছুক্ষণ আগে একটি আর্মি লরি লেকের পাশের রাস্তা দিয়ে ভিতরে যায় আর একটু পরেই প্রচণ্ড গোলাগুলির শব্দ হয়।'

আমি জানতে চাইলাম যে 'আর্মি লরি কি এখনো ওখানে আছে না কি?'

তিনি জানালেন 'না নাই, লরি চলে গেছে।'

আমি আরও জানতে চাইলাম 'কোথায় এবং কেন গুলী হল তার কি জানেন?'

উত্তর আসলো, 'না। মনে হয় শেখ মনি সাহেবের বাসায় গোলাগুলি হয়েছে!'

ইতোমধ্যে লুঙ্গী পরিহিত আমার সম বয়সী আর একজন এসে পাশে দাড়িয়ে আমাদের কথা শুনছিল। আমি শেখ ফজলুল হক মনির বাসার দিকে হাটতে লাগলাম। ঐ লোকটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। ঐ ফাঁড়ী থেকে শেখ ফজলুল হক মনির বাসা দুই থেকে তিন শত গজের মধ্যে (এখন যেখানে ম্যাডিনোভা ক্লিনিক তার পরে)। শেখ ফজলুল হক মনির বাসার গেট হাঁ করে খোলা, বাড়ি নীরব। উঁচু দেয়াল ও গেটের আড়ালে এবং রাস্তায় আধুনিক নিরাপত্তা আলোর ব্যবস্থা সহ এই বাড়িটিকে বরাবর দুর্গের মত মনে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ দারোয়ান ছাড়া আর্মড সিকিউরিটির ব্যবস্থা কোনদিন চোখে পড়েনি। খোলা গেট দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকলাম। নীচতলার বারান্দায় দাড়িয়ে হাঁক দিলাম 'বাসায় কে আছেন?'

কোন সাড়া শব্দ এলো না। সিঁড়ী ধরে দোতালায় উঠে গেলাম। সিঁড়ী ভিজা। দোতালার বারান্দা থেকে আবার ডাকলাম 'বাসায় কে আছেন? বাসায় কে আছেন?' বলে।

এবার একজন লোক বের হয়ে আসল। সে কাজের লোক বলে জানাল। তাকে জিজ্ঞাস করলাম 'কি হয়েছে? বাসার লোকজন কোথায়? মনি ভাই কোথায়?'

সে বলল 'মনি ভাইকে মেরে ফেলেছে।'

কথাটা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বুকে প্রচণ্ড একটা ধাক্কা অনুভব করলাম। ভাবলাম, তা কেমন করে হয়! দেশের অলিখিত দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে কয়েক জন এসে অতি সহজে হত্যা করে চলে যাবে তা কেমন করে হয়? জিজ্ঞাস করলাম 'কারা? কারা মারল?'

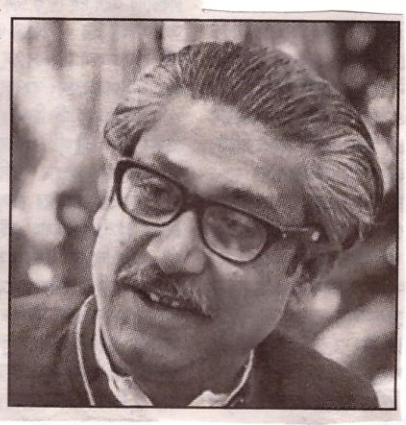

সে বলল 'আর্মির লোকেরা।'

আবার জিজ্ঞাস করলাম 'আর অন্যরা কোথায়?'

সে বলল 'ভাবীরও গুলী লেগেছে। ছোট ভাই বাবু, ভাবী ও ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।'

আমরা দুজনে বিমর্শ মনে সেই বাড়ী থেকে বের হয়ে আসলাম। সাত মসজিদ রোডে উঠে আমি ১৩/২ রোড ধরলাম বাসায় ফিরার জন্য, আর ঐ লোকটি উত্তর দিকে চলল। হাটতে হাটতে মনে পড়ল মনি ভাইয়ের সঙ্গে একদিন কথা হয়েছিল, তখনও বাকশাল হয়নি। পল্টনে জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার অপর দিকে এক বিল্ডিংয়ে তখন যুব লীগ ও কৃষক লীগের অফিস। সহযোদ্ধা ও উকিল মমতাজ ভাই (বর্তমানে বিচারপতি) তখন কৃষক লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক। আমি প্রায়ই ওখানে যেতাম আড্ডা দিতে। মমতাজ ভাইয়ের মাধ্যমে কৃষক লীগের সভাপতি ব্যারিস্টার বাদল রশিদের সঙ্গে ভাল পরিচয় ছিল। মমতাজ ভাই একদিন প্রায় জোর করেই আমাকে নিয়ে গেলেন উপর তালায় যুবলীগের অফিসে মনি ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করে দিতে। যুব লীগ অফিস তখন তরুণ যুবলীগ নেতা (পরে মন্ত্রী ও বর্তমানে আওয়ামী লীগ দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য) নাসিম সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ঐ ভিড়ের মধ্যেই মমতাজ ভাই আমাকে মনি ভাইয়ের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, মুক্তিযুদ্ধ কালে তাঁর গেরিলা দলের উপ কমান্ডার হিসাবে। মামুলি দুই চারটি কথা বলে আমি সেদিন বিদায় নিয়ে ছিলাম। জুন ১৯৭৫-এ বাকশাল গঠনের পর মনি ভাই নব গঠিত বাকশালের এক্সিকিউটিভ কমিটি ও সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য ও দেশের অলিখিত দ্বিতীয় ক্ষমতাধর ব্যক্তি হয়ে উঠেন। বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্যদের ছিল মন্ত্রীর পদ মর্যাদা। মনি ভাইয়ের মত ক্ষমতাধর একজন ব্যক্তিকে কয়েকজন অস্ত্রধারী এসে হত্যা করে চলে যাবে তা কেমন হয়? তাঁদের মত লোকেরও জীবনের নিরাপত্তা না থাকে তবে আমাদের মত সাধারণ লোকের জীবনে নিরাপত্তা আদৌ আছে কি? তবে আমাদের জন্য আরও হৃদয় বিদারক বড় চমক অপেক্ষা করছিল। হাটতে হাটতে আমি যখন জিগাতলা কাঁচা বাজারের মোড়ে পৌঁছি (তখন ওখানে কাঁচা বাজার ছিল না)। তখন সকাল ছয়টা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। মোড়ের চা-দোকানের সামনে ভীর জমে উঠেছে। জিগাতলা ওয়ার্ডের মেম্বার নূরু ভাইও ওখানে ছিলেন, আমিও থামলাম। সবাই রেডিও শুনছে। আমিও একটু দাড়িয়ে

Bangla Kagoj

Toronto August 20, 2013

শুনলাম, কোন এক মেজর ডালিমের রক্ত হিম করা ঘোষণা, 'শেখ মুজিবর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে' শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না? এ কি বিশ্বাস যোগ্য? আদৌ না। তবুও মর্মাহত ও বিমর্ষ মনে বাসায় ফিরলাম। বাসায় ফিরেই মার প্রশ্নের সম্মুখীন হলাম। মা জিজ্ঞাস করলেন, 'বঙ্গবন্ধুকে নাকি সপরিবারে মেরে ফেলেছে?'

আমি বললাম 'তাই তো শুনলাম।'

মা বললেন, 'কেন? কি দোষ তাঁর? আর বেগম মুজিবের কি দোষ ছিল? নতুন বৌরা কি দোষ করে ছিল? আর শিশু রাসেলের কি অপরাধ ছিল?'

মা প্রশ্ন করছিলেন আর তার দুই চোখ থেকে জলের ধারা বয়ে চল ছিল? আমি মা'র কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারলাম না। দ্রুত কাপড় পরে নিলাম। ভাবলাম, আমাদের কৃষি কলেজের হোস্টেলে গেলে সঠিক খবর পাওয়া যাবে। এবং যদি সত্যি হয় তবে ছাত্রলীগের ছেলেদের সঙ্গে এই নারকীয় অন্যায়ের প্রতিবাদে কিছু একটা হয়ত করা যবে। নাস্তা না খেয়েই বাসা থেকে বের হয়ে আসলাম। রাস্তায় যানবাহনর চলাচল নাই বললেই চলে। হেটেই রওনা দিলাম। ধানমন্ডির ভীতর দিয়ে ৩২নং রোড হয়ে যেতে চেষ্টা করলাম। আবাহনী মাঠের দক্ষিণ দিকে সাতমসজিদ রোডের উপরে আওয়ামী লীগ নেতা ও মুক্তিযুদ্ধ কালীন সময়ে প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের বাসা। রাস্তা থেকে মনে হল তিনি দোতালা বারান্দায় বসে আছেন। আমি আবাহনী মাঠের পেছনের রাস্তা ধরে লেক পার হয়ে ৩২ নম্বর দিয়ে যেতে চাইলাম। কিন্তু যাওয়া গেল না। আর্মিরা ঐ রাস্তা বক করে দিয়েছে। ধানমন্ডি বালিকা বিদ্যালয়ের পেছনে লেকের পাড় ও রাস্তা আর্মির দখলে। ওদিক দিয়েও যাওয়া গেল না। সেখান থেকে পিছিয়ে এসে ৮ নং সড়ক দিয়ে গিয়ে মিরপুর রোড ধরে অগ্রসর হলাম। ঐ রাস্তায় তখন লোকজন তেমন একটা ছিল না, হয়ত আর্মির ভয়ে। ৩২ নং রোডের মুখে দুই কি তিন টি ট্যাংক দাড়িয়ে আছে। কালো পোশাক ধারী জম দূতের মত সৈনিকরা কেউ কেউ তখন অস্ত্র হাতে ট্যাঙ্কের উপর বসে। আমি রাস্তার পূর্ব দিক ঘেঁসে আস্তে আস্তে চলছিলাম আর ওদের অবস্থা ও ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে দেখতে চেষ্টা করছিলাম। কালো পোশাক পরিহিত জম দূতদের একজন হাত উঠিয়ে আমাকে ইশারা করল দ্রুত ঐ এলাকা থেকে চলে যেতে। আমি মিরপুর রোড ধরে সোবহান বাগ, আসাদ গেট, কলেজ গেট হয়ে আগার গাওয়ের নিকটে আমাদের হোস্টেলের নিকটে পৌঁছলাম। হোস্টেলের সামনের মাঠের নিকটে পৌছতেই হোস্টেলে আনন্দ উৎসবের শব্দ পেলাম। তখন জাসদের ছেলেরা বদনা ও থালা বাজিয়ে আনন্দ নিতে মশগুল। আমাকে দেখে কয়েকজন জাসদ কর্মী বিগলিত হাসি হাসি মুখে ছুটে এসে বলল, 'দেখলেন জহির ভাই কি হল? আমরা যানতাম এমন একটা কিছু হবে!'

ওদের কথায় আমর খুব রাগ হল। আমি বললাম 'এত খুশি হইও না। দেখবে দশ বছরের মধ্যে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বঙ্গবন্ধুর স্ট্যাচু স্থান করে নিবে!'

তখন হোস্টেলে ও কলেজের ছাত্র সংসদ ছাত্রলীগের দখলে ছিল। এখানে উলেখ্য যে আমি ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া) সঙ্গে সংশিষ্ট ছিলাম। আমার পাশের রুমে মুজিব বাদী ছাত্র নেতা আমার এক সহপাঠী থাকত। ছাত্রলীগ নেতা সহপাঠীকে রুমে পাওয়া গেল না। আমার জুনিয়র দুজন মুজিব বাদী নেতার খোজে নীচ তলায় গেলাম। ওদের কাউকেও পাওয়া গেল না। ছাত্রলীগের সমর্থক দুই একজনের নিকট ওদের নেতারা কোথায় যানতে চাইলে ওরা জানাল যে নেতারা গাঁ-ঢাকা দিয়েছে। ছাত্রলীগের কোন নেতাকে হোস্টেলে পাওয়া গেল না। এতদিন যাদের কথায় কথায় বঙ্গবন্ধু ও মুজিব বাদের বুলি ফুটত, বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে জীবন দিতে প্রস্তুত ছিল, তাদের তখন কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। সবাই কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। আমি বাসায় ফিরার জন্য হোস্টেল থেকে বাহির হয়ে আসলাম। মনে আশা ছিল রক্ষী বাহিনী হয়ত এই অন্যায় সহ্য করবে না। ওরা হয়তো একশনে নামবে। তাই রক্ষী বাহিনী কিছু করছে কিনা বুঝার জন্য শেরেবাংলা নগরে রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্পের পাশ দিয়ে ঘুরে গেলাম। রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পটি ছিল খেজুর বাগান থেকে যে রাস্তাটি আগার গাও গিয়েছে সেই রাস্তা ও লেকের দক্ষিণ পাসের রাস্তার সংযোগ স্থলের উত্তর পাশে। ক্যাম্পটি ছিল মূলত এক তালা টিনের চাল ওয়ালা বেড়াক। আর গেট টি ছিল খেজুর বাগান আগারগাও রোডের উপরে। ওদের গেইটির সামনে একটি ট্যাংক থেমে আছে। ভিতরে শুন শান নিরবতা। কোন উত্তেজনা বা প্রস্তুতির লক্ষণ দেখতে পেলাম না। পরিস্থিতি দেখে হতাশ মনে হাটতে হাটতে বাসায় ফিরে আসলাম। মা ছুটে এলেন ভাল খবরের আশায়। আমি মাকে হতাশ করলাম এই বলে যে, 'এর প্রতিবাদে কোথাও কিছু হচ্ছে না আম্মা।'

হতাশার মধ্যেও মনে আশা ছিল আর্মি, রক্ষী বাহিনী, বিডিআর ও পুলিশ এর মধ্যে কেউ না কেই একশনে নামবে। এক দল নামলেই সবাই ছুটে আসবে এবং বাধ ভাঙ্গা জলের তোরে ঐ সব ডালিম-ফালিম সব ভেসে যাবে। তাই রেডিও সামনে নিয়ে বসলাম। রেডিওতে একটার পর একটা হতাশ করা খবর শুনতে পেলাম। প্রথমে সেনা বাহিনী প্রধান সফিউলহ আনুগত্য শিকার করলেন। তারপর একে একে অন্য বাহিনীর (নৌ, বিমান, বিডআর ও রক্ষীবাহিনী) প্রধান বা উপ-প্রধানগণ খুনি মোশতাক সরকারর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করল। ছোট ভাই কামাল খবর আনল যে, এলাকার লোক জন তাকিয়ে ছিল এলাকায় বসবাসরত আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ ও আব্দুর রাজ্জাক কিছু করবেন। তোফায়েল আহমেদ আবার রক্ষী বাহিনীর উপদেষ্টাও ছিলেন। আশা ছিল তিনি হয়তো রক্ষীবাহিনীকে দিয়ে কিছু একটা করবেন। আর আব্দুর রাজ্জাক এক সময় ছিলেন লাল বাহিনী প্রধান। কিন্তু তারাও এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে চলে গেছেন। আমাদের মনের সকল আশাগুলি এক এক করে নিভে গেল। ঐদিনই বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর খুনি মোস্তাক নিজকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করল। জাতীয় সংসদের সদস্য ও আওয়ামী লীগের অনেক নেতারাই ঐ বিশ্বাসঘাতকের মন্ত্রীসভায় যোগ দিল। কিন্তু জাতিয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ, মোঃ মনসুর আলী ও এ এইচ এম কামরুজ্জামান ঐ মীরজাফর সরকারে যোগ না দেওয়াতে তাদের কে কারাবন্দী করা হল? শুরু হল দেশে পাকিস্তানি সরকার কায়েমের! খুনি মোস্তাক এক ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় স্লোগান 'জয় বাংলা' বাতিল করে 'বাংলাদেশ জিন্দাবাদ' কায়েম করল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাঁড় ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ভুট্টু খুশিতে গদ গদ হয়ে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও পাকিস্তানি শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য শুভেচ্ছার নির্দেশন হিসাবে এক জাহাজ চাল পাঠানোর কথা ঘোষণা দিল। দিন গড়িয়ে চলল। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের পুরশ্কিত করা হল। আইন করে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার বিচারের পথ বন্ধ করা হল। দেশে অনেক উত্থান পতন হল। বিশ্বাসঘাতক সরকার গেল, সামরিক স্বৈরশাসকরা দুই দুইবার ক্ষমতা দখল করল। অনেক অনেক মুক্তিযোদ্ধা সামরিক অফিসারকে বাকি অংশ ৪৬ ⇨

হত্যা করা হল। অবশেষে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের উদ্যোগ নিলো। বিচার চলল কয়েক বছর ধরে। ইতোমধ্যে আমার নিজের সংসার হয়েছে। আমি তখন নিজের পরিবার নিয়ে ঢাকা শহরে জিগাতলা এলাকার পৈত্রিক বাসায়ই থাকি এবং সন্ধ্যায় ধানমন্ডি লেকের পাড়ে নিয়মিত হাটি। ১৯৯৮ সানে নভেম্বর মাসের গোঁড়ার দিকে (সম্ভবত ৮ই নভেম্বর) লেকের পাড়ে হাটতে হাটতে ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু বাড়ির নিকট পৌঁছে হাজার হাজার লোকের ভিড় দেখে আশ্চর্য হয়ে থমকে দাঁড়ালাম। লোক সমাগমের কারণ বুঝতে ভীর ঠেলে বঙ্গবন্ধু বাড়ির গেটের দিকে যেতে চেষ্টা করলাম এমন সম কোথা থেকে 'মামা' বলে ভাগ্নে তপন এসে সামনে দাঁড়াল। তপন আমার ইমেডিয়েট ছোট বোন জানুর বড় ছেলে (জানু বর্তমানে কমলাপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক কলোনি হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক)। তপন তখন ছাত্র এবং ছাত্রলীগ কর্মী। তপনের নিকট এই লোক সমাগমর কারণ যানতে চাইলাম। সে জানাল যে আজ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের রায় দিয়েছে - অভিযুক্ত ২০ জনের মধ্যে ১৫ জনকে গুলি করে মৃত্যু দন্ড কার্যকর করার আদেশ হয়েছে। তাই আবেগে ও মনের টানে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ, যুব লীগ ও মহিলা লীগের নেতা ও কর্মীরা বঙ্গবন্ধু কে পরিবার সহ যে বাড়িত হত্যা করা হয়েছিল সেখানে সমবেত হয়েছেন। তখন আমার মনেও দারুণ একটা প্রশান্তি নেমে আসল 'যাক, এত বছর পরে হলেও ঐ খুনিদের বিচার হল তা হলে! ঐ দাম্ভিক খুনিদের শেষ রক্ষা হল না! পাপ বাপকেও ছাড়ে না, কথাটি সত্য বলে আবারও প্রমাণিত হল।' সঙ্গে সঙ্গে আমার মায়ের কথা মনে পড়ল। মা আজ বেচে থাকলে খুবই খুশি হতেন। তেইশ বছর আগে (১৯৭৫) পরিবার সহ বঙ্গবন্ধুকে হত্যার জন্য মা অনেক কেঁদে ছিলেন এবং তাঁর সেই কষ্টের লাঘব আমরা করতে পারি নি। আজ তিনি বেচে থাকলে তার কষ্ট কিছুটা হয়ত প্রশমিত হত! পাশাপাশি মনে হল তপনদের জেনারেশনের তরুণরা যারা বঙ্গবন্ধুকে দেখেনি তবুও তারা তাঁর হত্যার বিচারের দাবীতে রাজপথ ছাড়েনি। গত দুই দশক ধরে পাকির দালালদের বঙ্গবন্ধুর নাম নিসানা মুছে ফেলার চেষ্টা তাহলে বিফলে গেছে! উল্টো স্রোতেও সচেতন তরুণ প্রজন্ম ভেসে যায়নি।